দৈনিক
ইত্তেফাক

7 JAN 2010
পৃষ্ঠা ১০

এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার মানোন্নয়নই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি-সংক্রান্ত নূতন একটি নীতিমালা অনুমোদন করিয়াছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। নীতিমালার খসড়া গত রবিবার প্রধানমন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে। নীতিমালা অনুযায়ী, চারটি সূচক বা মানদণ্ডের ভিত্তিতে অপেক্ষমাণ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বেতনভাতার সরকারি অংশ বা মাছুলি পেমেন্ট অর্ডার (এমপিও) প্রদান করা হইবে। সূচকগুলি হইল-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতির তারিখ, শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এবং ফলাফল। এইসব সূচকের ভিত্তিতে বিদ্যমান এমপিও বাতিল এবং স্থগিত করা হইবে। নূতন নীতিমালায় প্রতিটি সূচকের জন্য ২৫ নম্বর করিয়া এমপিওভুক্তির মানদণ্ড নির্ধারণে মোট ১০০ নম্বর বরাদ্দ রাখা হইয়াছে। নীতিমালায় উল্লেখিত শর্তপূরণে ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানকে প্রথম বৎসর সতর্কতামূলক চিঠি দেওয়া, ধারাবাহিকভাবে শর্তপূরণে ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বৎসর ২৫ শতাংশ এমপিও কর্তন এবং তৃতীয় বৎসরে ৫০ শতাংশ এমপিও কর্তনের বিধান রাখা হইয়াছে। চতুর্থ বৎসরে শর্তপূরণে ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানের এমপিও সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এবং এমপিও নীতিমালা সম্পর্কিত কমিটির প্রধান ড. আলাউদ্দিন আহমেদ বলিয়াছেন যে, সরকার সর্বজনগ্রাহ্য একটি নীতিমালা প্রণয়নের চেষ্টা করিয়াছে। বিশেষ কোনো দৃষ্টিভঙ্গি নয়, বরং শিক্ষার মানোন্নয়নই এই ক্ষেত্রে প্রধান বিবেচনা হিসাবে কাজ করিয়াছে বলিয়াও তিনি মন্তব্য করেন। মোটা দাগে উদ্যোগটি সময়োচিত এবং সরকারের উদ্দেশ্য সাধু বলিয়াই মনে হইতেছে।

সামগ্রিক বিবেচনায় সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির বিষয়টি কতোখানি গুরুত্বপূর্ণ তাহা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। ইহার সহিত শিক্ষার পরিকল্পিত প্রসার শুধু নয়, মানোন্নয়নের বিষয়টিও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জানা যায়, বর্তমানে দেশে ৫ সহস্রাধিক অপ্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। আবার প্রায় ৪ হাজার প্রয়োজনীয় স্থানে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাই। সরকারি সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ৯ সহস্রাধিক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা এমপিওভুক্তির অপেক্ষায় আছে। তন্মধ্যে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১ হাজার ৩ শত ৫৪টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২ হাজার ৬ শত ৯৮টি, দাখিল স্তরের প্রতিষ্ঠান ১ হাজার ৭ শত ৬টি এবং উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ ৫ শত ৮৬টি। এইগুলি ছাড়াও রহিয়াছে বিভিন্ন স্তরের বেশকিছু মাদ্রাসা এবং কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও। বস্তুত গত অর্ধযুগ ধরিয়া এমপিওভুক্তি বন্ধ থাকায় এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। অন্যদিকে, এমপিওভুক্তির সুযোগপ্রত্যাশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হইলেও বাজেটে এমপিও খাতে বরাদ্দের পরিমাণ চাহিদার তুলনায় খুবই কম। ফলে স্বচ্ছ একটি নীতিমালার ভিত্তিতে উপযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের বিষয়টি একপ্রকার অপরিহার্যই হইয়া পড়িয়াছে বলা যায়। বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে শিক্ষার মানোন্নয়নের অতি জরুরি প্রশ্ন তো আছেই।

নূতন নীতিমালায় আরও কিছু দরকারি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কাজের বার্ষিক মূল্যায়ন, শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতির জন্য সরকারি কর্মকমিশনের আদলে পৃথক কমিশন গঠন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি, শিক্ষায় অনগ্রসর ও ভৌগোলিকভাবে দুর্গম অঞ্চল এবং সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এমপিওভুক্তির এই নীতিমালা শিথিল করার ব্যবস্থাও রাখা হইয়াছে। সর্বোপরি, বলা হইয়াছে শিক্ষক ও কর্মচারীসহ বিদ্যমান জনবল বাড়ানোর কথাও। একই সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে অন্যতম পূর্বশর্ত হিসাবে জনসংখ্যার বিষয়টি বাদ দেওয়া হইয়াছে। বস্তুত কোনো নীতিমালাই চূড়ান্ত নহে। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে এইখানে সর্বদাই গ্রহণ-বর্জনের সুযোগ রহিয়াছে। লক্ষ্য অর্জনই হইল আসল।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রত্যাশিত মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য অর্জনের জন্য শুধু নীতিমালাই যথেষ্ট নয়। এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে বরাবরই কোনো না কোনো নীতিমালা অনুসরণ করা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবে ইহার কতোখানি সুফল পাওয়া গিয়াছে তাহা কাহারও অজানা নয়। এই ক্ষেত্রে মূল চ্যালেঞ্জটি হইল—সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতার সাথে নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। বলা বাহুল্য, এই ব্যাপারে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের অভিজ্ঞতা সুখপ্রদ নয়। পদে পদে ক্ষমতাসীন মহলের অযাচিত হস্তক্ষেপ, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি কোনো নূতন ঘটনা নহে। তাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল—এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে অবশ্যই সর্বপ্রকার দলাদলি ও অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপনা কমিটি রহিয়াছে। এইসব কমিটিতে যথাযোগ্য ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমে কমিটিগুলিকে পরিপূর্ণভাবে কার্যকর করিয়া তুলিতে হইবে। সরকারের দায়িত্ব হইল—নীতিমালা অনুযায়ী কমিটিগুলি তাহাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করিতেছে কিনা তাহা নিশ্চিত করা। ইহার জন্য অযাচিত হস্তক্ষেপ নয়, প্রয়োজন নিয়মিত ও কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক তদারকি বা মনিটরিং। নূতন নীতিমালায় এই দিকে অবশ্যই বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।